ISSN 1605-2021

লোক-প্রশাসন সাময়িকী
Lok Proshason Samoeeky
সংখ্যা: ৪৭/No. 47
জ্যৈষ্ঠ ১৪১৬/June 2008

ইউনিয়ন পরিষদ আইন-২০০৯: একটি পর্যালোচনা

ড. আ.ক.ম মাহবুবুজ্জামান*

Abstract: *"The Union Parishad Act-2009" is a latest law enacted for 'Local-Self Government' which has been passed in The Ninth National Parliament of Bangladesh in October 15, 2009. Before enacting this law, several acts have been made in favour of this institution since 1870, when the concept of 'Union Council' was incepted in the then Bengal province in British era. The name of this institution has been changed many times along with its authorities and responsibilities with the course of time. In fact, the Union Parishad is the only oldest local self-government institution in India, Pakistan and Bangladesh era, which deals with the grassroot level's people. Earlier it was a selection based institution, but in course of time it became an election based organization. After liberation war of Bangladesh, no female representative was in that organization. In 1976, two selected female representatives included in the parishad which number is increased up to three in 1983. The 'Ward' system has been introduced in 1973 which denotes the small unit of Union Parishad. Earlier there were 3 wards, where 9 members, 3 from each ward, were elected. From 1993 the union parishad had been devided into 9 wards where 1 member was elected from each ward and 3 old wards had been made reserved for only female candidates who will elected through competition among the female contestants.*

The salient feature of this law is to keep unchanged the prevalent ward and election system in open 9 wards and 3 female reserved wards. The commendable inclution is to constitute 13 'Parmanent Committees' with the light of 'The National Parliament', headed by 9 general ward members, 3 female members and 1 chairman. The permanent committees will look after 13 prescribed fields and suggest the parishad for overcoming the raised problems of those fields for the local people. Besides, 'Open Budget Formulation' system has been introduced which will be finalized in the pre-declared open meeting in all wards. Moreover, a 'Citizen Charter' also introduced to get desired information from the parishad excluding some 'Classical Documents' which bears secrecy of the government. It is notable that, the parishad has been empowered to take pecuniary measures against some particular crimes/offences up to 15000/ taka for first time offence and more 200/ taka per day cumulatively after 1st punishment in case of 2nd time offence. Most of the important particles of the present law have been critically and comparatively reviewd with previous laws and suggested some measures to the Government of Bangladesh.

* অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

প্রারম্ভ

বিগত ১৫ই অক্টোবর, ২০০৯ তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক 'ইউনিয়ন পরিষদ আইন -২০০৯' নামক স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত একটি আইন গৃহীত হয়েছে । নতুন এই আইনটি পর্যালোচনা করার সুবিধার্থে এবং ধারাবাহিকতা বা পারম্পর্য রক্ষার্থে ইন্দো-পাক-বাংলাদেশ আমলে জারিকৃত ইউনিয়ন পরিষদ ও স্থানীয় সরকার বিষয়ক আইনসমূহ প্রথমে আলোচনা করা প্রয়োজন । এ ছাড়া, স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞাসমূহ উল্লেখ করা হলে এ বিষয়ে আলোচনা ফলপ্রসূ হবে । যখন থেকে পৃথিবীতে 'রাষ্ট্র' ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রায় তখন থেকেই স্থানীয় পর্যায়ে শাসন কার্য পরিচালনার সূত্রপাত ঘটে । তবে আদি যুগে স্থানীয় পর্যায়ের শাসনের তেমন কোন সুনির্দিষ্ট রূপরেখা ছিল না । তখন কেন্দ্রীয় শাসনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ রূপে স্থানীয় শাসন বলবৎ ছিল । পরবর্তীকালে স্থানীয় পর্যায়ে শাসন কর্তাকে কিছু কিছু কাজের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেয়া হয় । তবে তা কখনই স্বায়ত্ব শাসনের মর্যাদায় উন্নীত হতে পারেনি । ভারতবর্ষে সর্ব প্রথম ১৮৭০ সালে 'গ্রাম চৌকিদারী আইন-১৮৭০' দ্বারা তৎকালীন লর্ড মেয়ো 'পঞ্চায়েত' নামক স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন, যার সদস্য সংখ্যা ছিল ৫ জন । কয়েকটি গ্রাম নিয়ে তখন একেকটি পঞ্চায়েত গঠিত হতো। পঞ্চায়েতের সদস্যবৃন্দ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ৩ বছরের জন্য মনোনীত হতেন । এদেশে তখন থেকেই সীমিত আকারে স্থানীয় পর্যায়ে স্বায়ত্ব শাসিত সরকার ব্যবস্থা চালু হয় ।

স্থানীয় সরকারের সংজ্ঞা

জাতিসংঘের প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী "স্থানীয় সরকার হলো একটি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক উপ-বিভাগ, যা আইন দ্বারা গঠিত হয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে সমুদয় কার্যক্রমে কার্যকর নিয়ন্ত্রণ আরোপের ক্ষমতা, বিশেষভাবে কর ধার্য করার ক্ষমতা রাখে ।"

এনসাইক্লোপেডিয়া অব সোশ্যাল সায়েন্সের ৯ ও ১০ নম্বর ভলিউমে 'উইলিয়ম এ. রফসন' সংজ্ঞা প্রদান করেছেন যে, "স্থানীয় সরকার বলতে একটি ভূখণ্ডগত অসার্বভৌম সম্প্রদায়কে বুঝায়, যাদের নিজস্ব বিষয়ে নিয়ন্ত্রণকারীর মত প্রয়োজনীয় আইনগত অধিকার সংগঠন আছে ।"

'চালস বারই' এর প্রদত্ত সংজ্ঞাটি অধিকতর বিস্তৃত ও স্ব-ব্যাখ্যাত । তিনি বলেছেন "স্থানীয় সরকার বলতে স্থানীয় জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত এমন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে বুঝায়, যাদের দায়িত্বাবলী নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকে । দায়িত্বাবলী পালনের নিমিত্তে নিজস্ব আয়ের উৎস হিসেবে স্থানীয় সরকার কর ধার্য করতে পারে । যদিও জাতীয় সরকার জনস্বার্থে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রতিষ্ঠা করে, তবুও তারা জাতীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন থেকে কাজ করে বা জাতীয় সরকারের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে।"

ভারত-পাক-বাংলাদেশ আমলে স্থানীয় সরকারের বিকাশ

ক) ১৮৭০ সালের 'গ্রাম চৌকিদারী আইন'

এই আইনে গঠিত মনোনীত ৫ জন সদস্য মূলতঃ নির্বাচিত জন প্রতিনিধি ছিলেন না। গ্রামের রাত্রিকালীন পাহারাদার বা চৌকিদারদের নিয়োগ, তত্ত্বাবধান ও বেতন প্রদান এবং বেতনের অর্থের জন্য জনগণের উপর কর ধার্যকরণ তৎকালীন পঞ্চায়েতের প্রধান কাজ ছিল।

খ) বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন আইন-১৮৮৫

লর্ড রিপন কর্তৃক পেশকৃত রেজুলিউশন দ্বারা এই আইনটি গঠিত হয়। সর্ব প্রথম এই আইনেই জনগণের মতামতের ভিত্তিতে (প্রকাশ্যে প্রস্তাব ও সমর্থন দ্বারা) নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ স্থানীয় সরকার গঠনের সুযোগ লাভ করেন। এই আইনে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার পাশাপাশি (১) ইউনিয়ন কমিটি (২) মহকুমা পর্যায়ে লোকাল বোর্ড এবং (৩) জেলা পর্যায়ে জেলা বোর্ড নামে তিন স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা চালু হয়। প্রতিটি ইউনিয়ন কমিটির আওতাধীন এলাকা ছিল ২৫.৯০ থেকে ৩৮.৮৫ বর্গ কিলোমিটার।

গ) বঙ্গীয় পল্লী স্বায়ত্বশাসন আইন-১৯১৯

এই আইনের মাধ্যমে ১৮৭০ ও ১৮৮৫ সালের আইন দু'টি বাতিল করে 'ইউনিয়ন বোর্ড' নামে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার ব্যবস্থা চালু করা হয়। ইউনিয়ন বোর্ডের কার্যকাল ছিল ৩ বছর, যা ১৯৩৬ সালে ৪ বছর করা হয়। এই আইনেও মহকুমা বোর্ড ও জেলা বোর্ড নামক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা চালু রাখা হয়। ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ৬ থেকে ৯ জন ছিল। ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত এবং সরকার কর্তৃক মনোনীত উভয় প্রকার সদস্য থাকতেন। ১৯৪৬ সালে মনোনীত সদস্য বাতিল করে কেবল নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা বোর্ড গঠনের আইন করা হয়।

ঘ) মৌলিক গণতন্ত্র আইন-১৯৫৯

এই আইনের দ্বারা ৪ স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা চালু করা হয়ঃ

১। ইউনিয়ন কাউন্সিল ২। থানা কাউন্সিল ৩। জেলা কাউন্সিল ৪। বিভাগীয় কাউন্সিল

এই আইনে প্রত্যক্ষ ভোটের (গোপন ব্যালট পেপারের) মাধ্যমে ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ নির্বাচিত হতেন। নির্বাচিত সদস্যবৃন্দের ভোটে ইউনিয়ন কাউন্সিল চেয়ারম্যান, প্রদেশিক পরিষদ ও জাতীয় পরিষদের সদস্য এমনকি রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত নির্বাচিত হতেন। ইউনিয়ন কাউন্সিলের আয়তন নির্ধারণে গড়ে ১০ হাজার জন বসতিপূর্ণ এলাকাকে নির্ধারণ করা হয় এবং ১০ থেকে ১৫ জন সদস্য সমন্বয়ে ইউনিয়ন কাউন্সিল গঠিত হতো। মোট ৩৭ প্রকারের কার্যক্রমের দায়িত্ব ইউনিয়ন কাউন্সিলকে দেয়া হয়।

ঙ) রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৭ (পি.ও নং-৭)

বাংলাদেশ আমলে ১৯৭২ সালে 'ইউনিয়ন কাউন্সিলে'র নাম পরিবর্তন করে 'ইউনিয়ন পঞ্চায়েত' রাখা হয়। এই সংস্থা প্রধানত : যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে ব্যস্ত ছিল। মনোনয়নের মাধ্যমে ইউনিয়ন পঞ্চায়েত সদস্যবৃন্দ ও চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এটি রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৭ (পি.ও নং-৭) দ্বারা কার্যকর হয়।

চ) রাষ্ট্রপতির আদেশ নম্বর ২২, ১৯৭৩

পুনারয় 'ইউনিয়ন পঞ্চায়েত' নাম পরিবর্তন করে 'ইউনিয়ন পরিষদ' রাখা হয়। প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদকে ৩টি ওয়ার্ডে ভাগ করে প্রতি ওয়ার্ডে ৩ জন করে সদস্য গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। প্রতি ইউনিয়ন পরিষদে একজন চেয়ারম্যান ছাড়াও ১ জন ভাইস চেয়ারম্যান প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখা হয়।

ছ) স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ-১৯৭৬

এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে ইউনিয়ন, থানা ও জেলা পরিষদ এই ৩ স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা চালু করা হয়। ৯ জন ইউ.পি সদস্য প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে, ২ জন মনোনীত মহিলা সদস্য ও ২ জন মনোনীত কৃষক প্রতিনিধি সমন্বয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়। ভাইস চেয়ারম্যান পদটি বিলুপ্ত করা হয়। ইউনিয়ন পরিষদকে মোট ৪০ প্রকারের কার্যক্রম পালনের দায়িত্ব দেয়া হয়। পরিষদের মেয়াদ ৫ বছর করা হয়।

ঞ) স্বনির্ভর গ্রাম সরকার আইন-১৯৮০

একজন গ্রাম প্রধান ও ২ জন মহিলাসহ মোট ১১ জন সদস্য নিয়ে গ্রাম সরকার গঠনের বিধান করা হয়। সদস্যদের মধ্যে একজনকে সচিব নির্বাচনের নিয়ম রাখা হয়। এই বিধানটি পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হওয়ার পূর্বেই ১৯৮২ সালে এটি বাতিল ঘোষিত হয়।

চ) স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা পুনর্গঠন) অধ্যাদেশ-১৯৮২

এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে থানাকে 'উপজেলা' নামে অভিহিত করে প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচনের বিধান করা হয়। এ থানার সকল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও পৌরসভার চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে সদস্য বিবেচিত হতেন। ৩ জন মহিলা মনোনীত সদস্য, ১ জন মুক্তিযোদ্ধা পরিষদের সদস্য ও ২ জন কৃষক প্রতিনিধি উপজেলা পরিষদের সদস্য মনোনীত হতেন। থানা পর্যায়ে কর্মরত সকল সরকারি দপ্তরকে, সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত বিভাগ হিসেবে উপজেলার আওতাধীন করা হয়।

ছ) স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ- ১৯৮৩

এই অধ্যাদেশ বলে প্রতি ওয়ার্ড থেকে ৩ জন করে তিনটি ওয়ার্ড থেকে ৯ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং প্রতি ওয়ার্ড থেকে ১ জন করে মোট ৩ জন মহিলা প্রতিনিধি (যাঁরা উপজেলা পরিষদ কর্তৃক মনোনীত হবেন) সমন্বয়ে চেয়ারম্যানসহ ১৩ সদস্য বিশিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হবে। এই অধ্যাদেশে ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব আয়ের ২৮ টি উৎস থেকে কমিয়ে এনে মাত্র ৫ টি উৎস রাখা হয়।

জ) পল্লী পরিষদ আইন-১৯৮৯

পল্লী অঞ্চলে স্বায়ত্বশাসন নিশ্চিত করার লক্ষে আইনটি পাশ করা হয়েছিল। কিন্তু তৎকালীন সরকারের পতনের পরে তা আর বাস্তবায়িত হয়নি।

ঝ) স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধনী) আইন- ১৯৯৩

এই আইন অনুযায়ী প্রতিটি ইউনিয়নকে ৯ টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করে প্রত্যেক ওয়ার্ড থেকে প্রত্যক্ষ ভোটে ১ জন করে নির্বাচিত সদস্য এবং প্রাক্তন ৩ টি ওয়ার্ড থেকে সংরক্ষিত মহিলা আসনে কেবল মহিলাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ৩ জন মহিলা সদস্য নির্বাচিত হবেন। চেয়রাম্যানসহ মোট সদস্য সংখ্যা হবে ১৩ জন। আয়ের উৎস হিসেবে ৬ টি খাতকে সুনির্দিষ্ট করা হয়। এই আইনে উপজেলা পরিষদকে 'থানা পরিষদ' নামে প্রতিস্থাপন্ন করা হয়।

ঞ) স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (২য় সংশোধনী) আইন-১৯৯৭

এই আইনে সংরক্ষিত মহিলা আসন ছাড়াও কোন মহিলা তার নিজস্ব ওয়ার্ডে বা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদে পুরুষদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন। এ ছাড়া থানা নির্বাহী অফিসার যেকোন সংরক্ষিত মহিলা আসনের ওয়ার্ড পুনঃযোজিত করতে পারবেন।

ট) ইউনিয়ন পরিষদ আইন- ২০০৯

১০৮ টি অনুচ্ছেদ সংবলিত এই আইনটি ২০০৯ সালের ১৫ই অক্টোবর কার্যকর হয়েছে। এই আইনে গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫২ (১) অনুচ্ছেদের সঙ্গে পঠিতব্য ৫৯ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ইউনিয়নকে প্রজাতন্ত্রের প্রশাসনিক একাংশ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এই আইনে 'স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ- ১৯৮৩' কে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

ইউনিয়ন পরিষদ আইন- ২০০৯ এর কতিপয় উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পর্যালোচনা

'ইউনিয়ন পরিষদ আইন- ২০০৯' এর কতিপয় উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এই প্রবন্ধে পর্যালোচনা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হলো। এখানে বিশেষ বৈশিষ্টমণ্ডিত অনুচ্ছেদসমূহকে আলোচনায় প্রাধান্য দেয়া হয়েছে ।

প্রথমত: ইউনিয়ন কে প্রজাতন্ত্রের প্রশাসনিক একাংশ ঘোষণা

গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫২ (১) অনুচ্ছেদের সঙ্গে পঠিতব্য ৫৯ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ইউনিয়নকে প্রজাতন্ত্রের প্রশাসনিক একাংশ ঘোষণার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ও সচেতন মহলের দাবি বহু পুরনো । প্রশাসনিক একাংশ ঘোষিত হলে সরকার কর্তৃক ইউনিয়ন পরিষদগুলোর ক্ষেত্রে উপেক্ষা ও বঞ্চনার কাহিনী বহুলাংশে লোপ পাবে, এ ধারণা পোষণ করেন স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত প্রায় সকল বিশেষজ্ঞ মহল । বহু কাল অপেক্ষার পর অবশেষে এ বার সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলো। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভেই আইনটিতে (অনুচ্ছেদ ৮) এই ঘোষণাটি উল্লেখিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: ওয়ার্ড সভা ও ওয়ার্ড পর্যায়ে উন্মুক্ত সভা

ইউনিয়ন পরিষদ আইন -২০০৯ এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, 'ওয়ার্ড সভা' নামক একটি নবতর বিষয় সংযোজন এবং 'ওয়ার্ড পর্যায়ে উন্মুক্ত সভা' অনুষ্ঠানের বিধান বলবৎকরণ। 'ওয়ার্ড সভা' বিষয়টি তৃণমূল পর্যায়ে গণতন্ত্র, প্রশাসনে জন অংশগ্রহণ এবং নির্বাচিত সদস্যদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি কার্যকর সংযোজন।

'ওয়ার্ড সভা' বলতে ইউনিয়ন পরিষদের ৯টি ওয়ার্ডের প্রতিটিতে ১ টি করে 'সভা' গঠনকে বুঝানো হয়েছে। ওয়ার্ডের প্রত্যেক ভোটার এই সভার সদস্য বিবেচিত হবেন, সংশিষ্ট ওয়ার্ডের নির্বাচিত সদস্য সভাপতি এবং ঐ ওয়ার্ডের সংশ্লিষ্ট সংরক্ষিত মহিলা আসনের প্রতিনিধি 'উপদেষ্টা' হিসেবে গণ্য হবেন। প্রত্যেক ওয়ার্ড সভায় বছরে কমপক্ষে ২টি উন্মুক্ত সভা অনুষ্ঠানের বিধান রাখা হয়েছে, যেখানে ঐ ওয়ার্ডের শতকরা ৫ ভাগ ভোটারের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে। স্থানীয় পর্যায়ের সকল

ভোটার যেভাবে বা যে উপায়ে সভার তারিখ ও সময় জানতে পারেন, সেই উপায়ে ৭ দিন পূর্বে বিজ্ঞপ্তি জারি করতে হবে। সবচেয়ে কার্যকর ও উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে যে, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানকে ঐ সভা অনুষ্ঠানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিষয়টিকে দুই পক্ষ থেকে নিশ্চিতকরণের উদ্যেগের ফলে কার্যকারিতার মাত্রা বৃদ্ধি করা হয়েছে ।

ওয়ার্ডের সভায়, বিশেষ করে বার্ষিক সভায় বিগত বছরে ওয়ার্ডের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বিবরণ পেশ করা হবে এবং পূর্ববর্তী ওয়ার্ডসভার কোন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত না হয়ে থাকলে তার যৌক্তিক কারণ দর্শাতে হবে। চলমান কার্যক্রম ও সার্বিক আর্থিক সংশ্লেষ সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ ঐ ওয়ার্ডের নির্বাচিত সদস্যকে উক্ত সভায় পেশ করতে হবে। এতে নির্বাচিত সদস্যবৃন্দের কেবল আর্থিক সততাই নয়, উন্নয়ন ক্ষেত্রে পারদর্শিতা ও পারঙ্গমতা প্রকাশিত হবে। ভালভাবে কাজ সম্পন্ন করে থাকলে প্রশংসা পাবেন, না করে থাকলে তাকে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হবে। আর যেহেতু এরূপ সভা প্রতি বছরে ২ টি করে অনুষ্ঠিত হবে, সেহেতু একবার কারণ দর্শিয়ে অপারগতাকে প্রমাণ করা গেলেও পরের বছর অনুরূপ কারণ দর্শানোর তেমন কোন সুযোগ থাকবে না। ফলে তৎপর ও কুশলী হবেন নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ এবং বৃদ্ধি পাবে জবাবদিহিতা । রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলে 'তথ্যই শক্তি'। যে সংস্থা বা যার নিকট তথ্য বেশি থাকে, সে সংস্থা বা সেই ব্যক্তি তত বেশি শক্তিশালী । ওয়ার্ডের উন্মুক্ত সভায় ঐ ওয়ার্ডের সমস্যসমূহ যেমন ভোটারগণ তুলে ধরবেন, তেমনি কী কী নিজস্ব সম্পদ রয়েছে অথবা কোন্ কোন্ কৌশলে উন্নয়ন নিশ্চিত করা যাবে, সেই সব বিষয়ের তথ্যও উদ্ঘাটিত হবে । সংশিষ্ট ভোটার ও নির্বাচিত সদস্যগণ তাদের সার্বিক বিষয় তথ্যের মাধ্যমে অবগত হতে পারবেন। এছাড়া ভোটার ও নির্বাচিত প্রতিনিধির মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় সম্মিলিত উদ্যোগে যে কোন সমস্যা মোকাবিলা করা সহজ হবে।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, ওয়ার্ড সভার হাতে ক্ষমতা ও কার্যাবলী নামে ২১ প্রকার ক্ষমতা ও ১০ টি দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে । এগুলো বাস্তবায়িত হলে ওয়ার্ডের উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে । এছাড়া , ওয়ার্ডের উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যে কোন সাধারণ বা বিশেষ কার্যাদি সম্পন্নকরণে এক বা একাধিক উপ-কমিটি গঠন করতে পারবে । উপ-কমিটির সদস্য সংখ্যা ১০ জনের বেশি হবে না এবং তার মধ্যে ৩ জন মহিলা থাকতে হবে । নারীর অংশগ্রহণ ও নারী ক্ষমতায়ন কে এ ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, যা তৃণমূল পর্যায়ে একটি নতুন আবহ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে । উপরন্তু, নারী ও শিশু পাচার রোধ, যৌতুক নিরোধ, বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহ রোধ, এসিড নিক্ষেপের মত জঘন্য অপরাধসমূহ দূরিকরণার্থে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষমতা ও দায়িত্ব ওয়ার্ড সভার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে । এ সব দায়িত্বের

অংশ বিশেষও যদি পালিত হয় তা হলেও গ্রাম পর্যায়ে নারী সমাজের মানবাধিকার বহুলাংশে রক্ষিত হবে ।

তৃতীয়ত: স্থায়ী কমিটি গঠন :

এই প্রথমবারের মত জাতীয় সংসদের অনুকরণে ইউনিয়ন পর্যায়ে 'স্থায়ী কমিটি ' গঠনের বিধান করা হয়েছে । এটি একটি যুগান্তকারী ঘটনা । ইউনিয়ন পরিষদের জন্য ১৩ টি স্থায়ী কমিটি গঠনের বিধান এবং প্রয়োজন বোধে ডেপুটি কমিশনারের অনুমতি গ্রহণপূর্বক আরও বেশি সংখ্যক স্থায়ী কমিটি গঠনের সুযোগ সংরক্ষণের জন্য এই আইনটি বহুদিন পর্যন্ত একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে । যে সমস্ত বিষয়ে স্থায়ী কমিটি গঠনের বিধান রয়েছে, সে গুলো হচ্ছে ;

ক) অর্থ ও সংস্থাপন খ) হিসাব নিরীক্ষা ও হিসাব সংরক্ষণ গ) কর নিরূপণ ও আদায় ঘ) শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা ঙ) কৃষি, মৎস্য ও পশু সম্পদ ও অন্যান্য অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কাজ চ) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন, সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ , ইত্যাদি ছ) আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা জ) জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন ঝ) স্যানিটেশন, পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ঞ) সমাজকল্যাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ট) পরিবেশ উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ ও বৃক্ষরোপণ ঠ) পারিবারিক বিরোধ নিরসন, নারী ও শিশু কল্যাণ (পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের জন্য প্রযোজ্য হবে না) ড) সংস্কৃতি ও খেলাধুলা ।

এই সব স্থায়ী কমিটির সভাপতি পদে পদাধিকার বলে ইউনিয়ন পরিষদ তথা ওয়ার্ডের নির্বাচিত মেম্বরবৃন্দ মনোনীত হবেন । তবে এ ক্ষেত্রেও সংরক্ষিত আসনের মহিলা মেম্বরবৃন্দ অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ কমিটির সভাপতি থাকবেন । অবশ্য কো-অপ্ট করা সদস্য কতিপয় ক্ষেত্রে সভাপতি হবার সুযোগ পাবেন । উল্লেখ্য, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কেবল আইন -শৃঙ্খলা বিষয়ক কমিটির সভাপতি থাকবেন । এসব স্থায়ী কমিটির সদস্য সংখ্যা হবে ৫ থেকে ৭ জন, তবে কমিটি প্রয়োজন বোধ করলে যে কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে কো-অপ্ট সদস্য হিসেবে মনোনীত করতে পারবেন । সদস্য হিসেবে স্থানীয় জনগণের মধ্য থেকে যোগ্য ব্যক্তিদের মনোনীত করা হবে । স্থায়ী কমিটির সুপারিশ ইউনিয়ন পরিষদে বিবেচনার জন্য গৃহীত হবে, যদি গৃহীত বা বিবেচিত না করা সম্ভব হয়, তা হলে তার যথার্থ কারণ লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটিকে জানানো হবে ।

জাতীয় সংসদের হুবহু অনুকরণ করে প্রণীত এই 'স্থায়ী কমিটি'র গঠন কাঠামো হয়তো বা ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রথম প্রথম তেমন কার্যকারিতা দেখাতে সক্ষম নাও হতে পারে, কিন্তু এক সময়ে এটি স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় এক বৈপ-বিক পরিবর্তন সাধন করবে । ক্ষমতা কাঠামোতে অধিক সংখ্যক লোকের সমাবেশ ঘটানোর প্রয়াস জনগণের মাঝে নতুন উদ্দীপনা সঞ্চার করবে এবং ক্রমাগত অনুশীলনে অংশগ্রহণ, জবাবদিহি ও

দক্ষতার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠবে । এর ফলে পরোক্ষভাবে বিপক্ষীয়, বিরোধীয় ও উপ-দলীয় কোন্দল পর্যাপ্ত পরিমাণে হ্রাস পাবে বলে প্রত্যাশা করা যায় । তৃণমূল পর্যায়ে গণতন্ত্রের ভিত্তি রচনা করার একটি অনুশীলন ক্ষেত্র হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ ভূমিকা পালন করতে পারবে ।

চতুর্থত: উন্মুক্ত বাজেট

ইউনিয়ন পর্যায়ের জনগণের দীর্ঘ দিনের দাবি ছিল 'উন্মুক্ত বাজেটে'র। কারণ, বহুভাবে বিভিন্ন বিধানে ইঙ্গিত থাকলেও ইউনিয়ন পরিষদের আয় ও ব্যয় সাধারণ জনগণ কোন দিন জানতে পারতো না। অবশ্য দু'একটি ব্যতিক্রমী ইউনিয়ন পরিষদ উন্মুক্ত বাজেট ইতঃপূর্বে ঘোষণা করেছে, তবে তার সংখ্যা খুবই নগণ্য। বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদ আইনে এটিকে বিশেষ বিধান রূপে গণ্য করে আর্থিক বছর আরম্ভ হবার ৬০ দিন পূর্বে ওয়ার্ড সভার মাধ্যমে অগ্রাধিকার নির্ণয়পূর্বক ব্যয়ের খাত এবং আয়ের উৎস নিশ্চিত করার কথা উল্লেখিত আছে। ফলে জনসাধারণ তাদের আকাঙ্ক্ষিত বাজেট পেশ করা, পর্যালোচনা করা ও একাত্মতা ঘোষণা করার সুযোগ লাভ করবে। এতে তাদের মনে হবে, 'এটি তাদের নিজস্ব বাজেট'।

অপর পক্ষে, জন প্রতিনিধিবৃন্দ যে বাজেট পেশ করলেন বা পাশ করালেন, তার একটি কপি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট প্রেরিত হবার কারণে সরকারি দপ্তর থেকেও জবাবদিহি অবকাশ রয়ে যাবে। আবার কোন ইউনিয়ন পরিষদ বাজেট প্রণয়নে ব্যর্থ হলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার দপ্তর থেকে একটি প্রত্যায়িত বাজেট ইউনিয়ন পরিষদে প্রেরিত হবে। এরূপ ক্ষেত্রে সেটিই তাদের বাজেট বলে বিবেচিত হবে। বাজেট প্রণয়নে কোন ত্রুটি থাকলেও উপজেলা নির্বাহী অফিসার ৩০ দিনের মধ্যে তা সংশোধন করে পাঠাবেন। এছাড়া, ইউনিয়ন পরিষদও বছরে যে কোন সময় ধার্য বাজেট 'সংশোধন' করে উপজেলা নির্বাহী দপ্তরে পাঠাতে পারবে। এভাবে বাজেটের ক্ষেত্রে জনমতের প্রতিফলন, বোটম-আপ পদ্ধতিতে বাজেট প্রণয়ন, সংশোধনের সুযোগ, বাস্তবায়নের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নির্ধারিত হয়ে একটি গণমুখী বাজেট বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

পঞ্চমত : তথ্য প্রাপ্তির অধিকার

বিশ্ব জুড়ে বাংলাদেশের প্রশাসনিক দুর্বলতার যে সব ক্ষেত্র সর্বাপেক্ষা আলোচিত, তথ্য না পাওয়ার অথবা তথ্য পাবার অধিকারহীনতা তার মধ্যে অন্যতম। তথ্যের গোপনীয়তা বজায় রাখার নামে জনগণকে তথ্য থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে বহুকাল ধরে। তাদের কোন তথ্য জানার যে অধিকার আছে, তারও স্বীকৃতি মেলেনি বহুদিন। বর্তমানে আইনে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে ইউনিয়ন পরিষদ সংক্রান্ত যে কোন তথ্য পাবার অধিকার বাংলাদেশের যে কোন নাগরিকের

থাকবে। এতে শুধু সংশিষ্ট ইউনিয়নেরই নয়, বাংলাদেশের সকল নাগরিকের যে কোন ইউনিয়ন পরিষদের তথ্য পাবার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। অবশ্য একান্ত গোপন কোন সরকারি নথিকে সরকার 'ক্লাসিফাইড' করে জনস্বার্থে গোপন রাখতে পারবে। বর্তমান আইনে 'নন-ক্লাসিফাইড' যে কোন তথ্য প্রাপ্তির নির্ধারিত আবেদন ফরম ও নির্ধারিত ফি যেমন রাখা হয়েছে, তেমনি সেই তথ্য প্রদান বা প্রেরণে বিলম্ব করলে পরিষদ সচিব বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রতি বিলম্বিত দিনের জন্য ৫০ টাকা হারে জরিমানা করার বিধানও রাখা হয়েছে। তথ্য সরবরাহ না করলে বা ভুল তথ্য দিলে সংশিষ্ট কর্মকর্তা অন্যূন ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত হবেন, সেই বিধানও রয়েছে। আইনটির নিগুঢ় অর্থ হচ্ছে, সরকার যে কোন নাগরিকের জন্য তথ্য প্রাপ্তির দরজা উন্মুক্ত করলো, যে দরজা এতদিন প্রায় অনেকটাই রুদ্ধ ছিল।

ষষ্ঠত: নাগরিক সনদ (Citizen Charter)

বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদ আইনে 'নাগরিক সনদ প্রকাশ' একটি নবতর সংযোজিত বিধান। পূর্বে এরূপ কোন স্পষ্ট বিধান ছিল না, যদিও কিছু কিছু সেবা বা পরিসেবা ইউনিয়ন পরিষদ পূর্বেও প্রদান করতো। একটি ইউনিয়ন পরিষদ কী কী ধরনের সেবা কত পরিমাণ ফি'য়ের বিনিময়ে দিতে পারবে বা দিবে, তার একটি তালিকা ইউনিয়ন পরিষদ প্রকাশ করবে। কতদিনের মধ্যে সেবাটি দিতে পারবে, তারও নির্ধারিত সময় বর্ণিত থাকবে। উদাহরণত বলা যায়, কোন নাগরিকের চারিত্রিক সনদের প্রয়োজন। এক্ষেত্রে কোন্ নিয়মে, কত ফি দিয়ে, কোন্ যোগ্যতা বলে একজন নাগরিক আবেদন করতে পারবে এবং কতদিনের মধ্যে পরিষদ তাকে ওই সনদ সরবরাহ করবে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিষদ ওই সনদ সরবরাহ না করলে নাগরিক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে কি'না, ইত্যাদি প্রত্যেকটি বিষয়ে পরিষদ সকলের সম্মুখে জ্ঞাত বা প্রচার করে রাখবে। এভাবে নাগরিক তার প্রাপ্ত সেবা প্রাপ্তির বিষয়ে সচেতন থাকবে এবং কোন প্রকার ভুল বোঝা-বুঝির সৃষ্টি হবে না।

বর্তমান আইনের ৪৯ নম্বর অনুচ্ছেদে নাগরিক সনদ সম্পর্কে ৪টি উপ-অনুচ্ছেদ বর্ণনা করে বিষয়টিকে আরও সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে । উপ-অনুচ্ছেদ ৪-এ নাগরিক সনদ সংক্রান্ত বিধিমালার অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের বর্ণনায় বলা হয়েছে ;

ক) প্রতিটি সেবার নির্ভুল ও স্বচ্ছ বিবরণ খ) সেবা প্রদানের মূল্য গ) সেবা গ্রহণ ও দাবি করা সংক্রান্ত যোগ্যতা ও প্রক্রিয়া ঘ) সেবা প্রদানের নির্দিষ্ট সময়সীমা ঙ) সেবা সংক্রান্ত বিষয়ে নাগরিকদের দায়িত্ব চ) সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা ছ) সেবা প্রদান সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া জ) সনদে উল্লিখিত অঙ্গীকার লঙ্ঘনের ফলাফল

সপ্তমত: অপরাধ ও দণ্ড

ইউনিয়ন পরিষদের হাতে পূর্বেও কিছু বিচারিক ক্ষমতা প্রদত্ত ছিল । বর্তমান আইনে ৫৪ প্রকারের অপরাধের বিচার নিস্পত্তির প্রচেষ্টা ও দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ইউনিয়ন পরিষদের উপর । কোন্ কোন্ প্রকারের বিচার পরিষদের আওতাভুক্ত হবে তার একটি তালিকা ৫ম তফশিলে বর্ণিত হয়েছে। এই ৫৪ প্রকার অপরাধের মধ্যে পরিবেশ রক্ষা, কর ফাঁকি রোধ, ভেজাল মিশ্রণ রোধ, পতিতা বৃত্তি রোধ, শব্দ দূষণ রোধ, বিপজ্জনক স্থাপনা অপসারণ ও ক্রটিপূর্ণ স্থাপনা নির্মাণ রোধ প্রভৃতি বিষয়ে অধিকতর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে । প্রথমবার অপরাধকারীর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১৫,০০০/ টাকা অর্থ দণ্ড এবং পুনরাবৃত্তির ক্ষেত্রে প্রথম অপরাধের পরবর্তী প্রতি দিনের জন্য ২০০/ টাকা হারে পুঞ্জিভূত অর্থদণ্ড প্রদানের বিধান রয়েছে। পুলিশ কর্মকর্তাদেরকে পরিষদ চেয়ারম্যান , সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তার লিখিত অনুরোধের ভিত্তিতে আইনসঙ্গত দায়িত্ব পালনে সহায়তা প্রদানের নির্দেশ এই আইনে রয়েছে ।

অষ্টমত : ইউনিয়ন পরিষদের লোকবল

ইউনিয়ন পরিষদে একজন সচিব ও একজন পিয়ন পদ বহু পুর্ব থেকে বলবৎ ছিল । মূলত সচিবকেই সর্বপ্রকার কাজের দায়িত্ব পালন করতে হতো । বর্তমান আইনে সচিব ছাড়া একজন হিসাব সহকারি-কাম কম্পিউটার অপারেটরের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে । প্রত্যেক পরিষদে কম্পিউটার ব্যবহারের মাধ্যমে 'ডাটা বেইজ' গড়ে তোলাই এর উদ্দেশ্য। এর মাধ্যমে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, তালাক সংক্রান্ত তথ্যাদিসহ ইউনিয়নের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংরক্ষণ এবং খুব সহজে তা উদ্ঘাটন ও প্রয়োজনে কোন সংস্থা বা ব্যক্তিকে তথ্য প্রদান সম্ভবপর হবে । কর নির্ধারণ ও আদায়ের হালনাগাদ তথ্যাদি এবং আয়ের উৎস সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ সহজতর হবে । ফলে বর্তমান তথ্যাদিসহ পূর্বের তথ্যাদি প্রাপ্তি নিশ্চিত করা যাবে । অনুচ্ছেদ ৫০-এ 'উন্নততর তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ও সুশাসন' নামে পৃথক একটি অনুচ্ছেদ সংযোজন করে ডিজিটাল পদ্ধতি তথা উন্নত তথ্য সংরক্ষণ পদ্ধতির ব্যবহারকে নিশ্চিত করা হয়েছে।

নবমত: ওয়ার্ডের সীমানা নির্ধারণ

ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ডসমূহের সীমানা নির্ধারণ চিরকালই একটি জটিল ও বিবাদপূর্ণ বিষয় বলে পরিগণিত । রাজনৈতিক দলসমূহের ইউনিয়ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ তাদের নির্বাচনে জয়লাভের হাতিয়ার হিসেবে সাধারণত সীমানা নির্ধারণকে ব্যবহার করে থাকে। এ ক্ষেত্রে সরকারি দল ও বিরোধী দলের মধ্যে তুমুল বাদ-বিবাদ হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায় এবং সেই অজুহাতে দীর্ঘ দিন অবধি নির্বাচন বন্ধ থাকে। এ যাবত যতগুলো আইন করা হয়েছে, কোনটি দ্বারাই এ অবস্থার খুব একটা তারতম্য ঘটেনি। বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদ আইনও সেই অবস্থার

খুব একটা হের ফের ঘটাতে পারেনি। বর্তমান আইনে বিবৃত হয়েছে যে "ওয়ার্ডের সীমানা নির্ধারণে ভৌগোলিক অখন্ডতা, জনসংখ্যার বিন্যাস ও প্রশাসনিক সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে এমন ভাবে ওয়ার্ডের সীমানা নির্ধারিত হবে, যাতে একটি ওয়ার্ড থেকে আরেক ওয়ার্ডের লোক সংখ্যা ১০% এর কম বা বেশি না হয় (অনুচ্ছেদ নং ১৩)।" তাৎক্ষণিকভাবে অনুচ্ছেদটি বেশ যথার্থ ও তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হলেও কার্যত ইতোমধ্যেই তা বহু ভাবে সমালোচিত হয়েছে। যাঁরা বাংলাদেশের গ্রামের গঠন কাঠামো সম্পর্কে পূর্ণরূপে ওয়াকিবহাল. তাঁরা বিলক্ষণ জানেন যে, গ্রামগুলোর একটির সঙ্গে আরেকটির লোক-সংখ্যাগত পার্থক্য এত বেশি যে মাত্র ১০% পার্থক্যের মধ্যে বিভাজনে এগুলোকে অটুট রাখা সম্ভব হবে না । আর ভৌগোলিক অখণ্ডতা ধরে রাখা না গেলে কেবল ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থ হানি নয়, গ্রামগুলোর উন্নয়নসহ সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে পর্যাপ্ত সমস্যা দেখা দেবে ।

সীমানা নির্ধারণের এই অনুচ্ছেদটি জারি হবার পর হিসাব করে দেখা গেছে যে, ১০% ব্যবধানের এই হার বজায় রেখে ওয়ার্ড নির্ধারণ করা হলে বাংলাদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ গ্রামকে বিভক্ত করতে হবে, যা কোন ক্রমেই সমীচীন হবে না। কারণ, প্রাচীন কাল থেকে গড়ে ওঠা গ্রামগুলোর একটির সঙ্গে আরেকটির জনসংখ্যার তারতম্য গড়ে প্রায় ২৫%থেকে ৪০% । বিষয়টি নিয়ে ইতোমধ্যেই 'বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ ফোরাম' আপত্তি জানিয়েছে এবং স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় অনুচ্ছেদটি পরিবর্তনের আশ্বাস প্রদান করেছে বলে জানা গেছে ।

দশমত: ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের কার্যকাল বা মেয়াদ

পূর্ববর্তী আইনসমূহের মতো এই আইনেও নির্বাচিত পরিষদের মেয়াদ বা কার্যকাল ৫ বছর ধার্য করা হয়েছে। তবে এই আইনে ৫ বছরের শেষ ৬ মাসের (১৮০ দিন) মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে আইনে বর্ণিত রয়েছে {অনুচ্ছেদ ২৯(৩)} । তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে, শেষ ৬ মাস পরিষদ সদস্যবৃন্দ অনেকটা 'কেয়ার-টেকার পরিষদে'র চরিত্র গ্রহণ করবে । এতে প্রকারান্তরে পরিষদের মেয়াদ হয়ে যাচ্ছে ৪ বছর ৬ মাস। অবশ্য এই অনুচ্ছেদ অনুসারে ইউনিয়ন পরিষদের মেয়াদান্তে পরবর্তী নির্বাচনের মধ্যেকার বিরতির জন্য সময় নষ্ট হতো না । তবে পূর্ববর্তী আইনসমূহে প্রদত্ত মেয়াদ অকস্মাৎ পরিবর্তীত হওয়াকে কিছুতেই মেনে নিতে চাচ্ছে না 'বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ ফোরাম' নেতৃবৃন্দ। এ ক্ষেত্রে আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে অনুচ্ছেদটি পরিবর্তনের । বাংলাদেশের মতো একটি দরিদ্র দেশের পক্ষে ইউনিয়ন পরিষদসমূহের নির্বাচনের ন্যায় এত বিশাল ও ব্যয়বহুল নির্বাচন ৫ বছরের পূর্বে বহন করা আর্থিক ভাবে সমীচীন কাজ বলে কোন অর্থনীতিবিদই মত দেবেন না। তাছাড়া নির্বাচনের সঙ্গে জড়িত থাকে আরও নানা উপসর্গ, যেমন ; আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, অরাজকতা, নির্বাচন পরবর্তী মামলাসমূহ, নাশকতামূলক তৎপরতা প্রভৃতি, যেগুলোর জন্যও পর্যাপ্ত

খুব একটা হের ফের ঘটাতে পারেনি। বর্তমান আইনে বিবৃত হয়েছে যে "ওয়ার্ডের সীমানা নির্ধারণে ভৌগোলিক অখন্ডতা, জনসংখ্যার বিন্যাস ও প্রশাসনিক সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে এমন ভাবে ওয়ার্ডের সীমানা নির্ধারিত হবে, যাতে একটি ওয়ার্ড থেকে আরেক ওয়ার্ডের লোক সংখ্যা ১০% এর কম বা বেশি না হয় (অনুচ্ছেদ নং ১৩)।" তাৎক্ষণিকভাবে অনুচ্ছেদটি বেশ যথার্থ ও তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হলেও কার্যত ইতোমধ্যেই তা বহু ভাবে সমালোচিত হয়েছে। যাঁরা বাংলাদেশের গ্রামের গঠন কাঠামো সম্পর্কে পূর্ণরূপে ওয়াকিবহাল. তাঁরা বিলক্ষণ জানেন যে, গ্রামগুলোর একটির সঙ্গে আরেকটির লোক-সংখ্যাগত পার্থক্য এত বেশি যে মাত্র ১০% পার্থক্যের মধ্যে বিভাজনে এগুলোকে অটুট রাখা সম্ভব হবে না । আর ভৌগোলিক অখণ্ডতা ধরে রাখা না গেলে কেবল ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থ হানি নয়, গ্রামগুলোর উন্নয়নসহ সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে পর্যাপ্ত সমস্যা দেখা দেবে ।

সীমানা নির্ধারণের এই অনুচ্ছেদটি জারি হবার পর হিসাব করে দেখা গেছে যে, ১০% ব্যবধানের এই হার বজায় রেখে ওয়ার্ড নির্ধারণ করা হলে বাংলাদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ গ্রামকে বিভক্ত করতে হবে, যা কোন ক্রমেই সমীচীন হবে না। কারণ, প্রাচীন কাল থেকে গড়ে ওঠা গ্রামগুলোর একটির সঙ্গে আরেকটির জনসংখ্যার তারতম্য গড়ে প্রায় ২৫%থেকে ৪০% । বিষয়টি নিয়ে ইতোমধ্যেই 'বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ ফোরাম' আপত্তি জানিয়েছে এবং স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় অনুচ্ছেদটি পরিবর্তনের আশ্বাস প্রদান করেছে বলে জানা গেছে ।

দশমত: ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের কার্যকাল বা মেয়াদ

পূর্ববর্তী আইনসমূহের মতো এই আইনেও নির্বাচিত পরিষদের মেয়াদ বা কার্যকাল ৫ বছর ধার্য করা হয়েছে। তবে এই আইনে ৫ বছরের শেষ ৬ মাসের (১৮০ দিন) মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে আইনে বর্ণিত রয়েছে {অনুচ্ছেদ ২৯(৩)} । তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে, শেষ ৬ মাস পরিষদ সদস্যবৃন্দ অনেকটা 'কেয়ার-টেকার পরিষদে'র চরিত্র গ্রহণ করবে । এতে প্রকারান্তরে পরিষদের মেয়াদ হয়ে যাচ্ছে ৪ বছর ৬ মাস। অবশ্য এই অনুচ্ছেদ অনুসারে ইউনিয়ন পরিষদের মেয়াদান্তে পরবর্তী নির্বাচনের মধ্যেকার বিরতির জন্য সময় নষ্ট হতো না । তবে পূর্ববর্তী আইনসমূহে প্রদত্ত মেয়াদ অকস্মাৎ পরিবর্তীত হওয়াকে কিছুতেই মেনে নিতে চাচ্ছে না 'বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ ফোরাম' নেতৃবৃন্দ। এ ক্ষেত্রে আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে অনুচ্ছেদটি পরিবর্তনের । বাংলাদেশের মতো একটি দরিদ্র দেশের পক্ষে ইউনিয়ন পরিষদসমূহের নির্বাচনের ন্যায় এত বিশাল ও ব্যয়বহুল নির্বাচন ৫ বছরের পূর্বে বহন করা আর্থিক ভাবে সমীচীন কাজ বলে কোন অর্থনীতিবিদই মত দেবেন না। তাছাড়া নির্বাচনের সঙ্গে জড়িত থাকে আরও নানা উপসর্গ, যেমন ; আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, অরাজকতা, নির্বাচন পরবর্তী মামলাসমূহ, নাশকতামূলক তৎপরতা প্রভৃতি, যেগুলোর জন্যও পর্যাপ্ত

সময় হাতে থাকা প্রয়োজন । পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, ইউনিয়ন পরিষদের কার্যকাল ৫ বছর পর্যন্ত পূর্ণ থাকাই অধিকতর যুক্তিপূর্ণ হবে ।

একাদশত: নির্বাচিত পরিষদ সদস্যবৃন্দের সাময়িক বরখাস্তকরণ ও অপসারণ

পূর্ববর্তী আইনসমূহেও অপসারণের বিধান ছিল যা চেয়ারম্যানের ক্ষেত্রে সদস্যগণের সম্মিলিত 'অনাস্থা ভোটে'র মাধ্যমে এবং সদস্যগণের ক্ষেত্রে 'মারাত্মক নৈতিক স্খলন জনিত' কারণে । অবশ্য 'মারাত্মক নৈতিক স্খলন জনিত কারণে' পরিষদের যে কোন নির্বাচিত সদস্যেরই অপসারণের বিধান বহুদিন থেকে বলবৎ আছে । তবে এবার যে সমস্ত বিষয়কে 'অপসারণের কারণ' হিসেবে বর্তমান আইনে বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলো অত্যন্ত কঠোর ও অমানবিক, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে মানবাধিকার পরিপন্থি বলেও বিবেচিত হচ্ছে । যেমন, অনুচ্ছেদ ৩৪ এর উপ-অনুচ্ছেদ ৪-এ বর্ণিত পরিষদের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যদের অপসারণের কারণ হিসেবে 'ক) যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া পর পর ৩টি সভায় অনুপস্থিতি' কেও একটি কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, যা 'অপসারণ'-এর মতো সর্বোচ্চ শাস্তির কারণ হতে পারে বলে কেউ মেনে নিতে চাচ্ছেন না এবং এটিকে মানবাধিকার পরিপন্থি বলেও মনে করছেন অনেকে। এছাড়া, ৩৪ নম্বর অনুচ্ছেদে 'চেয়ারম্যান বা সদস্যগণের সাময়িক বরখাস্ত করণ ও অপসারণ ' শিরোনামে বর্ণিত আছে যে,"উপ-অনুচ্ছেদ ৪-এ বর্ণিত (উপ-অনুচ্ছেদ ৪-এ মোট ৮টি ধারা রয়েছে) যে কোন ধারায় চেয়ারম্যান বা সদস্যদের বিরুদ্ধে অপসারণের জন্য কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়েছে অথবা তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলায় অভিযোগপত্র আদালত কর্তৃক গৃহীত হয়েছে অথবা অপরাধ আদালত কর্তৃক আমলে নেয়া হয়েছে, সে ক্ষেত্রে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের মতে চেয়ারম্যান অথবা সদস্য কর্তৃক ক্ষমতা প্রয়োগ পরিষদের স্বার্থের পরিপন্থি অথবা প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণে সমীচীন না হলে, সরকার লিখিত আদেশের মাধ্যমে চেয়ারম্যান অথবা সদস্যকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করতে পারবে।" এই সাময়িক ভাবে বরখাস্তের ধারণাটি একটি নতুন সংযোজিত ধারণা এবং 'নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ' এই উপ-অনুচ্ছেদের ক্ষমতাবলে যেকোন নির্বাচিত চেয়ারম্যান বা সদস্যকে যে কোন সময় সাময়িক বরখাস্তের আওতায় আনার একটি মারাত্মক অস্ত্র হাতে পেয়ে যাবেন । এই যে 'কর্তৃপক্ষের মতে' এবং 'স্বার্থের পরিপন্থি বিবেচিত হওয়া' প্রত্যয়সমূহ স্বজন-প্রীতি সৃষ্টির একটা উৎকৃষ্ট পদ্ধতি । আইনের ক্ষেত্রে যে যে স্থানে এরূপ প্রত্যয়সমূহ রয়েছে, সে সে ক্ষেত্রে স্বজন-প্রীতি অজান্তে বাসা বেঁধেছে । সুতরাং 'সাময়িক বরখাস্তকরণ' বিষয়টি এই আইন থেকে বাতিল করা শ্রেয়তর বিবেচিত হচ্ছে আইন-বোদ্ধাদের নিকট ।

দ্বাদশত : প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা

আইনটির ৯৭ নম্বর অনুচ্ছেদে প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদকে এই আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রবিধানসমূহ সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে স্বীয় ইউনিয়ন পরিষদের

জন্য প্রণয়ন করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যন্ত সহায়ক একটি সংযোজন এই প্রবিধানের প্রণয়নের জন্য ১৭ প্রকারের বিষয় নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ হচ্ছে: পরিষদের কার্যাবলী পরিচালনা, সভা আহ্বান, কোরাম নির্ধারণ, স্থায়ী কমিটির বিষয়াদি ও কার্যাবলী পরিচালনা, কোন সদস্য/কর্মকর্তা/ কর্মচারী কে পরিষদের চেয়ারম্যানের ক্ষমতা অর্পণ, সাধারণের ব্যবহার্য সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ, শ্মশান ও কবরস্থান নিয়ন্ত্রণ, সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ, অবৈধ দখল রোধকরণ, গবাদি পশুর খোয়াড় ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষাসফর ,পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি উপলক্ষে সরকারী বা বেসরকারি বিদেশ ভ্রমণ প্রভৃতি। এটিও নবতর সংযোজিত বিষয় এবং খুবই প্রয়োজনীয় একটি সংযোজন, যার অভাব বোধ করতো প্রায় প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ এ যাবৎ কাল। এখানে একটি বিষয়কে প্রকারান্তরে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে যে, বাংলাদেশের প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ আসলে তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে অনন্য (Unique) এবং একটি অপরটি থেকে বেশ ভিন্নতর। ফলে প্রত্যেকের নিজস্ব প্রবিধান প্রণীত হলে সেটিই কেবল তার সার্বিক বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবে।

উপসংহার

পৃথিবীতে কোন আইনই সর্ব-যুগোপযোগী ও কাল-নিরপেক্ষ নয় । মানুষের কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে মানুষ আইন প্রণয়ন করে এবং প্রয়োজন পূরণে ব্যর্থ হলে বা যুগের সঙ্গে তাল মেলাতে অসমর্থ হলে আইনের পরিবর্তন ও পরিমার্জন অবশ্যম্ভাবী হয়ে যায়। তাছাড়া একবিংশ শতাব্দির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এবং ডিজিটাল যুগের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার জন্যও এই প্রাচীন প্রতিষ্ঠানটির আইনী কাঠামো পর্যাপ্ত পরিমাণে উন্নততর হওয়া আবশ্যকীয় বিবেচিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেদিক থেকে বিবেচনা করা হলে আইনটি প্রণয়ন করা খুবই সময়োপযোগী হয়েছে। বিশেষত: ওয়ার্ড সভা, স্থায়ী কমিটি গঠন, উন্মুক্ত বাজেট প্রণয়ন পদ্ধতি, নাগরিক সনদ প্রকাশ, উন্নততর তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ও সুশাসন, অপরাধ ও দন্ড, প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা প্রভৃতি বিষয়াবলীর সন্নিবেশ এই আইনটিকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেছে। কেবল কয়েকটি ক্ষেত্রের; যেমন, ওয়ার্ডের সীমানা নির্ধারণ, পরিষদের কার্যকালের মেয়াদ এবং সাময়িক বরখাস্তকরণের ক্ষেত্রে কিছুটা দুর্বলতা বা সমস্যা রয়ে গেছে, যা সংশোধনীর মাধ্যমে দূর করা হলে আইনটি বর্তমান কালের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে ।

আরও একটি বিষয়ে আইনটির মৌলিক দুর্বলতা আইন প্রণেতাগণ ভেবে দেখবেন, তা হলো ইউনিয়ন পরিষদসমূহ সব চেয়ে বেশি অকার্যকর হয়ে থাকে আয়ের উৎস-হীনতায়। বর্তমান আইনেও সেটি দূর করার সুদূর প্রসারী চিন্তার প্রতিফলন খুব একটা স্পষ্ট নয় এবং খুব বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বলেও প্রতীয়মান হচ্ছে না। নিজস্ব

আয়ের সুনির্ধারিত উৎস সৃষ্টি করা না গেলে এই প্রতিষ্ঠানটির বিশাল অক্ষমতা কিছুতেই দূরিভূত হবে বলে বিশেষজ্ঞবৃন্দ বিশ্বাস করেন না। শুধু করারোপ, ট্যাক্স, টোল ও রেইট আরোপ করে এরূপ একটি বিশাল প্রতিষ্ঠানকে হয়তো বাঁচিয়ে রাখা যাবে, কিন্তু নিজস্ব আয়ের সৃজনশীল ও উৎপাদনমুখী কোন উৎস সৃষ্টি করা না গেলে কেন্দ্রের প্রতি বুভুক্ষের মতো চেয়ে থাকা এবং স্থানুর মতো স্থির ও অটল হয়ে অনুন্নয়নের দুষ্ট বৃত্তে আটকে থাকা কিছুতেই রোধ করা যাবে না।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

Ahmed A.U. (1989). "Revitalizing Panchayeti Raj in India." Journal of Local Government. Dhaka: NILG, Vol. 18, No.1, Jan.-June.

Alam, Manjur-ul. (1977). "Local Government at Work in Rural Bangladesh." Journal of BARD. Vol. VI, No. 2, 1977. Dhaka.

Ali, M.M. Showkat. (1982). Field Administration & Rural Development in Bangladesh. Dhaka: CSS.

Metealfe, Sir Charls. (1952). Report of The Select Committee of The house of Commons.Vol. .1952.

Molla, Md.Giasuddin. (1978). "New Hopes for Union Parishads: Case of Bangladesh." Administrativ Science Review. Vol. VIII, No.1. 1978.

Rahman, Atiur. (1981). Rural Power Structure: A Study of The Local Level Leaders in Bangladesh. Dhaka: BBI.

Rahman, M. Lutfur and Das, N.R. (1980). "Union Parishad Taxes: Nature of Payment by The Farmers." Administrative Science Review. Vol. x, No. 4.m. 1980. Dhaka.

Siddiqui, Kamal. (1992). Local Government in South Asia. Dhaka: UPL.

আজম,কে. কিউ. এবং আলী আজম হোসাইন (১৯৭৯) "ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন সমস্যা - চেয়ারম্যানবৃন্দ যে ভাবে ব্যক্ত করেছেন।" Local Government Quarterly.Vol.8, No.1-4. Dhaka.

আলম, জগলুল (১৯৮২) "গ্রামীণ প্রশাসন : কয়েকটি সমস্যা।" দৈনিক বাংলা, জুলাই ২০, ১৯৮২। ঢাকা।

কাদের, মুহাম্মদ আবদুল (১৯৯৭) "বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিকাশ।" লোক-প্রশাসন সাময়িকী , ৮ম সংখ্যা, মার্চ-১৯৯৭। সাভার, ঢাকা : বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

গুহঠাকুরতা, মেঘনা ও সুরাইয়া বেগম (১৯৯৭) " রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও নারী আন্দোলন : প্রসঙ্গ বাংলাদেশ।" নারী প্রতিনিধিত্ব ও রাজনীতি (গুহঠাকুরতা, মেঘনা ও অন্যান্য সম্পাদিত)। ঢাকা : সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র ।

বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ ফোরাম (২০০৯) ইউনিয়ন পরিষদ আইন -২০০৯। ঢাকা : বি ইউ পি এফ, তোপখানা রোড।

রহমান, এ. এইচ. মোঃ আমিনুর (১৯৭৮) "বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা।" Local Government Quarterly. Vol.7, No.1-4. Dhaka.

সুলতানা, আবেদা (২০০০) "ইউনিয়ন পরিষদে নারীর ক্ষমতায়নে প্রশিক্ষণের ভূমিকা।" লোক-প্রশাসন সাময়িকী , ১৭শ সংখ্যা, ডিসেম্বর ,২০০০। সাভার, ঢাকা: বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ।

হক, আবুল ফজল (১৯৭৪) বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি । ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

হোসেন, মৌসুমী (২০০০) "ক্ষমতায়নে ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যদের ভূমিকা: সমস্যা ও সম্ভাবনা " (এল. জি. ই.ডি. সেমিনারে উপস্থাপিত গবেষণা প্রতিবেদন, তাং: জুলাই ৬, ২০০০) ঢাকা।

লোক-প্রশাসন সাময়িকী বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অন্যতম নিয়মিত প্রকাশনা, এটি কেন্দ্রের ত্রৈমাসিক জার্নাল। প্রতি ইংরেজি বছরের মার্চ, জুন, সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে এ সাময়িকী প্রকাশিত হয়। লোক-প্রশাসন সাময়িকীতে কেন্দ্রের অনুষদ সদস্য, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, বিভিন্ন কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ কর্তৃক বাংলা বা ইংরেজি ভাষায় লিখিত সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক মৌলিক ও গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তবে লোক-প্রশাসন, উন্নয়ন অর্থনীতি, ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক প্রবন্ধ অধিক গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়।

- প্রবন্ধটি মৌলিক এবং অন্য কোন জার্নাল বা সাময়িকী, সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি বা প্রকাশের জন্য প্রেরিত হয়নি এ-মর্মে প্রবন্ধ জমা দেয়া বা প্রেরণের সময় একটি লিখিত বিবৃতি প্রদান করতে হবে।

- লেখা মানসম্পন্ন সাদা কাগজে (রিপোর্ট সাইজ) পর্যাপ্ত মার্জিন রেখে এক পৃষ্ঠায় ১২ ফন্টে ডাবল স্পেসে কম্পিউটারে মুদ্রিত হতে হবে। মূল পাণ্ডুলিপির সঙ্গে কম্পিউটার ডিস্কেটে অথবা sanwarsamia@gmail.com এবং sakhandaker@gmail.com e-mail address-এ প্রবন্ধের সফ্ট কপি প্রেরণ করতে হবে। কম্পিউটারে কম্পোজের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ফন্টের ব্যবহার অনুসরণ করতে হবে: বাংলা "বিজয় সুতন্বী" এবং ইংরেজি: "টাইমস নিউ রোমান"।

- প্রেরিতব্য কম্পিউটার ডিস্কেটের কভারে লেখকের নাম, লিখিত প্রবন্ধের নাম এবং সংশ্লিষ্ট ফাইলের নাম উল্লেখ করতে হবে।

- প্রবন্ধে বাংলা একাডেমী অনুমোদিত বানান পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

- মূল কপিসহ পাণ্ডুলিপির ২ (দুই) প্রস্ত (পরিচ্ছন্ন কপি) সম্পাদক বরাবরে পাঠাতে হবে। প্রবন্ধের উপর আলাদা কাগজে (কভার পেজে) প্রবন্ধের শিরোনামসহ লেখকের নাম পদবী ও ঠিকানা উল্লেখ করতে হবে। প্রবন্ধের কোথাও লেখকের নাম উল্লেখ করা যাবে না।

- ভিন্ন কাগজে লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত প্রবন্ধের সাথে যুক্ত করতে হবে। প্রত্যেক লেখার সাথে ইংরেজিতে অনধিক ১৫০ শব্দের মধ্যে প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার (Abstract) প্রেরণ করতে হবে।

- প্রবন্ধের পাদটীকায় ও তথ্যপঞ্জিতে লেখক, গ্রন্থস্থান, প্রকাশক, বছর ও পৃষ্ঠা এবং সাময়িকীর ক্ষেত্রে লেখক, প্রবন্ধের নাম, সাময়িকীর নাম, খণ্ড ও ইস্যু সংখ্যার বছর ও পৃষ্ঠা ইত্যাদি প্রচলিত প্রমিত নিয়ম (Standard) অনুসারে উল্লেখ করতে হবে।

- লেখা প্রকাশিত হলে লেখক সাময়িকী'র ৫ কপি বিনামূল্যে পাবেন।

- প্রাপ্ত প্রবন্ধটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পাদনা পরিষদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং অমনোনীত প্রবন্ধ ও ডিস্কেট সাধারণত লেখককে ফেরৎ দেয়া হয় না, তবে বিশেষ প্রয়োজনে ফেরৎ পেতে হলে এতদসংক্রান্ত ব্যয়ভার লেখককে বহন করতে হবে।

- মুদ্রিত প্রবন্ধের জন্য লেখককে নির্ধারিত হারে সম্মানী প্রদান করা হবে।